হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 7, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, May 2011

চিরজীবন দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মের নামে ভাববাদিতার সুযোগ লইয়া শক্তিশালী হইতে সময় পাইয়াছিলেন এবং পান্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের দুর্ব্বলতার জন্য অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। এ সব কথা ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন। কুরুক্ষেত্রে (তীর্থস্থান) আসিয়া যুধিষ্ঠিরের 'ধর্ম্মমোহ' এবং 'স্বজাতিমোহ' দুইই আশা করিয়া বিনাযুদ্ধে পুত্রদের বিজয়ের আশা করিয়াছিলেন। — শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

চারঘাট ফাঁড়ির হিন্দু বিরোধী

পুলিশ অফিসার প্রভাত প্রামাণিকের অত্যাচার

হিন্দুর সামাজিক উৎসবের অধিকারও বন্ধ হতে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট অঞ্চলের খাবরাপোতা গ্রামের বিতর্কিত দরগার মূল জায়গাটি স্বর্গীয় কামদেব বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতিমন্দির, হিন্দুদের দেবোত্তর সম্পত্তি। জনৈক মৌলবাদী লাল মিঞা এই সম্পত্তি দখল করে সেখানে পাকা মসজিদ ও দরগা বানিয়ে মাইক বেধে নামাজ পড়ছে। চারবছর আগে এই অবৈধ মসজিদ তৈরীতে সহযোগিতা করেছিল স্বরূপনগর থানার তৎকালীন ও.সি. জুলফিকার মোল্লা, এছাড়া সমর্থন ছিল সি.পি.এম. অঞ্চল প্রধান জাহানারা বেগম ও ব্লক সমিতির সভাপতি শেখ রাজীব মন্ডলেরও।

মসজিদের সামনে বড় মাঠ সেই মাঠে হিন্দুর ছেলেরা খেলা করত সেই খেলাও বন্ধ করে দিয়েছে মুসলিমরা। ঐ মাঠে বিগত প্রায় ছয় দশক ধরে চড়কের মেলা ও নাম সংকীর্তন হয়ে আসছে। পাঁচদিন ধরে চলে আসা এই মেলা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে গত বছর থেকে। এবছরও স্থানীয় ভারতী সংঘ ক্লাবের মাধ্যমে ঐ মাঠে ১২ এপ্রিল রক্তদান শিবির, নীলপূজা, চড়ক, নাম সংকীর্তন ও ১লা বৈশাখে ঐখানে মন্দিরে (বিতর্কিত দরগা) হালখাতার পূজার অনুষ্ঠান বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই আয়োজন করলে মুসলিমরা সক্রিয় হয়ে পড়ে। কিছুতেই তারা এই অনুষ্ঠান করতে দেবেনা। তাদের সন্তুষ্ট করতে পুলিশ এসে অনুষ্ঠানে বাধা দেয়। অনুষ্ঠানের জন্য তৈরী করা মঞ্চ ভেঙে দেয়। স্থানীয় হিন্দু নারী-পুরুষরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, তারা পুলিশ প্রশাসনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ব্লক অফিসে, পঞ্চায়েত অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক বসে। আলোচনা চলতে থাকে কিভাবে এই অনুষ্ঠান আটকানো যায়। ১০ এপ্রিল স্বরূপনগর থানার ও.সি. আনন্দমোহন চক্রবর্তী ও চারঘাট ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার প্রভাত প্রামাণিকের এতটাই ঔদ্ধত্য যে চড়কের জন্য তৈরী থানকে লাথি মেরে ভেঙ্গে দেয়। ১১ এপ্রিল হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে গেলে প্রশাসনের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এস.ডি.পি.ও. বসিরহাট এ. সরকার, সি. আই.- ডি. পান, এডিশনাল এস.পি. হোসেন মির্জ্জার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রভাত প্রামাণিকের অসভ্য আচরণের জন্য স্থানীয় মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেন।

সেইমত রক্তদান ও দুদিনের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। স্থানীয় ৩৩ জন রক্তদান করেন যার মধ্যে ১৬ জন মহিলা। কিন্তু মুসলিমরাও চুপ করে বসে ছিল না। তাদের তোষণকারী রাজনৈতিক নেতাদের চাপে পুলিশ হিন্দুদেরকে বাকী দুদিনের অনুষ্ঠান করতে দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সামনে একটাই প্রশ্ন— বিতর্কিত স্থানে মসজিদে মাইক লাগিয়ে নামাজ পড়া চলবে, মুসলিমরা তাদের অনুষ্ঠান চালাতে পারবে , কিন্তু হিন্দুরা তাদের অধিকার পাবে না।

চারঘাট খাবরাপোতার হিন্দুরা উক্ত ৫৪ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি ও তাদের মন্দিরের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে হিন্দু সংহতি সক্রিয়ভাবে তাদের পাশে আছে। বয়স্করা আপোষে ও আইনের পথে সমস্যার সমাধান চাইছেন। আদালতের মামলায় হিন্দুদের জয়ও হয়েছে। কিন্তু সেই মামলার রায়কে কার্যকরী করার মতো সাহস ও সদিচ্ছা কোনটাই পুলিশ প্রশাসনের নেই। আর রাজনৈতিক দলগুলির তো নেইই । স্বরূপনগর ব্লকে ২০০১ সালে ৪৫ শতাংশ মুসলিম ছিল এখন হয়ত শতকরা ৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ত্রিপুরায় শিব মন্দির ধ্বংস

ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় টাকার জলা থানার গোলাঘাটি এলাকায় বিশালগড় গ্রামে ২৫ বছরের পুরানো একটি শিবমন্দির আছে। এটি আগরতলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত গত ৩০ শে এপ্রিল শনিবার বেলা ১১ টা নাগাদ প্রায় ৩০-৩৫ জন মুসলিম যুবক এসে ঐ শিবমন্দিরে হামলা চালায়, মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে দেয় এবং আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কেন তারা এরকম করল তার কোন কারণ জানা যায়না। এই ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা চরম ক্ষুব্ধ। হিন্দু যুবকরা এখনই এর প্রতিকার করতে চায় কিন্তু বয়স্করা বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের শান্ত রেখেছে। মন্দিরের পুরহিত নিমাই রায় থানায় গিয়ে হামলাকারীদের নাম দিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। হামলাকারীদের নাম সাজাহান মিঞা, হারুন মিঞা, সুমন মিঞা, জানু মিঞা, নীল মিঞা, হাসেম মিঞা এবং অনান্যরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন সি.পি.এম. দল এক লক্ষেরও বেশী বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে অবৈধ ভাবে ত্রিপুরায় বসিয়েছে। ভোটের লোভে পার্টির এই আত্মঘাতী নীতি ত্রিপুরার সর্বনাশ ডেকে আনছে। ২০০১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৮.২৯ শতাংশ।

[সুত্র ঃ দৈনিক স্যন্দন পত্রিকা, ০৪/০৫/১১]

সবিতা মন্ডলের ইজ্জত লুট হল

আবার জীবনতলা থানা। দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামে চড়পাড়ার অতি দরিদ্র দিনমজুর রাধাকান্ত মন্ডল। তার মা-মরা ১৭ বছরের মেয়ে সবিতা মন্ডল। বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে সবিতাকে একাই ঘরে থাকতে হয়। দরমার বেড়া দেওয়া একটা কাঁচা ঘর। তাদের বাড়ির সামনে একটা খোলা জায়গা পড়ে আছে। সেখানে কিছু যুবক নেশা করে ও আড্ডা দেয়। গত ৮ ই এপ্রিল দুপুরে সবিতার বাবা কাজে বেড়িয়ে গেলে সবিতা একা ঘরে ছিল। দুপুর দু'টো নাগাদ সাইফুদ্দিন মিস্ত্রি ও পাপ্পু শেখ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে সবিতার বাড়ির বাইরে থেকে জল চায়। সবিতা প্রথমে জল দিতে চায়না। কিন্তু ওই মাতাল দুজন জোর করায় সবিতা বাধ্য হয়ে একটি জলের বোতল বেড়ার বাইরে থেকে তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। জল চাওয়া তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তারা লাথি মেরে দরমার গেট ভেঙে দিয়ে তার ঘরে ঢোকে। সাইফুদ্দিন সবিতার হাত ও জামা কাপড় ধরে টানতে থাকে। সবিতা ভয়ে চিৎকার করে। কিন্তু আশপাশের কোন বাড়ি থেকে কেউ এগিয়ে আসেনা। কারণ সবাই ওই গুন্ডাদের ভয় পায়। তখন সাইফুদ্দিন সবিতাকে প্রচন্ড মারধর করে, ফলে তার প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেঙে যায়। তখন সহজেই সাইফুদ্দিন সবিতার জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে। সবিতা অজ্ঞান হয়ে যায়। সর্বপ্রকারের সবিতার ইজ্জত লুট করা হয়।

কুকাজ সমাপ্ত করে বদমাসরা চলে যাওয়ার পর প্রতিবেশী যুবক রাজকুমার রাম বেরিয়ে এসে সবিতাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডাকাডাকি করে অন্য লোকজন ডেকে আনে। তারা সবাই সবিতার চোখেমুখে জল দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। বিকাল ৪ টায় রাধাকান্ত মন্ডল বাড়ি ফিরে মেয়ের ঐ অবস্থা দেখে ভেঙে পড়ে। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ক্যানিং থানায় গিয়ে অভিযোগ করে। অপরাধী সাইফুদ্দিন মিস্ত্রি, পিতা সাবির আলি মিস্ত্রি বাড়ি ক্যানিং থানার উত্তর তালদির কৃষ্ণ কলোনিতে।

ক্যানিং থানার পুলিশ সবিতাকে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তার মেডিক্যাল টেস্টও করায় না, লিখিত অভিযোগও না নিয়ে তাদেরকে জীবনতলা থানায় যেতে বলে। পরদিন ৯ ই এপ্রিল সকালে বাবা ও মেয়ে জীবনতলা থানায় যায়। তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে তারপর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। সবিতার ছেঁড়া জামাকাপড়ও দেখে। পুলিশ অফিসার রাধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করে যে তার বাড়ি গেলে সে ঐ ভাঙা গেট দেখাতে পারবে কিনা? রাধাকান্ত বলে- নিশ্চয়ই পারি। তখন ও.সি. বলেন তিনি শীঘ্রই তার বাড়িতে যাবেন তদন্ত করতে। তিনিও সবিতার মেডিক্যাল টেস্ট করানোর কোন ব্যবস্থা করেন না এবং ডায়েরী বা এফ. আই. আর. এর কোন নম্বরও দেন না।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও পুলিশ সবিতার বাড়ি তদন্তে যায় না। তখন রাধাকান্ত হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। সংহতি কর্মীদের সাহায্যে আলিপুর এস.পি. অফিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অপরাধী সাইফুদ্দিন কয়েকদিন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু ১১ তারিখে ফিরে এসে আবার এলাকায় বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে সামসুদ্দিন শেখ ওরফে গাড্ডা নামে এক সমাজবিরোধীর আশ্বাসে সে এলাকায় ফিরে এসেছে। এই গাড্ডা সি.পি.এম. এর বড় নেতা সওকৎ মোল্লার ঘনিষ্ঠ। সুতরাং অতি দরিদ্র রাধাকান্ত মন্ডলের মেয়ে সবিতাদের সম্ভ্রম লুট হতেই থাকবে।

বনগাঁয় হিন্দু সংহতির রক্তদান ও সম্মেলন

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন স্মরণ করে হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখা। স্বামীজীর জন্মদিনকে স্মরণ করতে বনগাঁ শাখা দুটি কাজ করে। প্রথম, সেবার জন্য রক্তদান। দ্বিতীয়, সুরক্ষার জন্য হিন্দু সম্মেলন। গত ১৬ জানুয়ারী সকাল ১০ টায় বনগাঁ টাউন হলে রক্তদান শিবির হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ তুষারকান্তি বিশ্বাস। প্রধান অতিথি ছিলেন সংহতির সহ সভাপতি উপানন্দ ব্রহ্মচারী। উপস্থিত ছিলেন সংহতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী চিত্তরঞ্জন দে। ছিলেন এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশচন্দ্র দাস ও আরো অনেকে। বনগাঁ হাসপাতাল থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে এসেছিল। সংহতির যুবক যুবতীরা মোট ৩০ জন রক্তদান করে।

এই উপলক্ষে বনগাঁ শাখার শ্রী অজিত অধিকারীর নেতৃত্বে এলাকাতে বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রচার চলে। বাটার মোড়ে হিন্দু সংহতির বিশাল তোরণ করা হয়। সংহতি যুবকদের এক মোটর সাইকেল র‍্যালিও হয়। বিকাল ৩ টায় টাউন ক্লাব ময়দানে এক হিন্দু জনসভা হয়। বিশাল এই জনসভায় স্থানীয় হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির রাজ্য সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ, নদীয়া ভারতমাতা মন্দিরের সাধ্বী স্মৃতিদেবী। স্থানীয় অনেকেই ভাষণ দেন। সকলের বক্তব্যে একটাই সুর— বাংলাদেশ হবার ফলে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গটা বাংলাদেশ হলে পালাবে কোথায়? তাই মাটি কামড়ে লড়াই করা এবং ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সামনে একমাত্র রাস্তা। এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই সভার ফলে বনগাঁর হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

আমাদের কথা

নির্বাচন পরবর্তী

বিশ্বসন্ত্রাসী জেহাদী লাদেন মরল। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনও শেষ হল। হয়ত বামপন্থীরা ক্ষমতা হারাবে। এসব ঘটনা দেখে মনে হয় যে ইতিহাস কখনও শেষ হয়ে যায় না। ইতিহাসের নতুন নতুন পাতা লেখা হতেই থাকে। সেইসব নতুন পাতায় আমরা ইতিহাসের নির্মাতা, নাকি আমরা শুধুই তার পরিণাম— তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, পুরুষোকারে বিশ্বাসীরা ইতিহাসের নির্মাতা হয়। আর ভাগ্যবাদীরা ইতিহাসের পরিণাম হয়। মনে পড়ে চাণক্যের কথা, শঙ্করাচার্য্যের কথা, বিদ্যারণ্য স্বামীর কথা, সমর্থস্বামী রামদাসের কথা। মনে পড়ে রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ, ঝাঁসীর রাণী শুধু নয়, মঙ্গল পাণ্ডে, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, হকীকত্ রায়ের মত অতি সাধারণ ঘরের সন্তানদের কথা। এরা কেউই ভাগ্যবাদী ছিলেন না। এদের ছিল পৌরুষ। তাই ছিল উদ্যম। তাই এরা ইতিহাস নির্মাণ করে গিয়েছেন।

তবুও সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাধারণ হিন্দু এদের মত নয়। তারা ভাগ্যবাদী, উদ্যমহীন, তাই তারা ইতিহাসের শিকার।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পরে ইতিহাসের যে নতুন পাতা লেখা শুরু হবে, তার জন্য হিন্দুদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। মুসলিমরা, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের মুসলিমরা একচেটিয়া দল পাল্টে মমতা ব্যানার্জ্জীকে সমর্থন করছে। ফলে মমতা ক্ষমতায় বসার পর সেই সাফল্যের ভাগ তারা চাইবেই। আর মমতা তো ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েই রেখেছেন। নতুন সরকারের কাছে মুসলিমরা শুধু উন্নয়নের ভাগ চাইবে, নাকি তাদের কোরান নির্দেশিত পথে পশ্চিমবঙ্গকে দারুল ইসলামে পরিণত করার জন্য ইজাজত্ চাইবে তা দেখার। তাদের অন্যায়, অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক দাবীর কাছে মাথা নীচু করে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার যেমন লেখিকা তসলিমা নাসরীনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়ে ছিলেন, আগামীদিনে মুসলিমদের ঐরকম সব অন্যায় দাবীর সামনে পড়ে মমতা ব্যানার্জ্জী কিরকম আচরণ করেন— তার উপরেই নির্ভর করবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্য।

আমাদের কার্যালয়ে ক্রমাগত আসতে থাকা খবরগুলি থেকে আমরা ভবিষ্যতের কিছুটা পূর্বাভাষ পাচ্ছি। ভোটের পর পুলিশ সরে যেতেই কয়েকস্থানে মুসলিমরা অবৈধ মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করে দিয়েছিল, দুই স্থানে, উস্তির পিঁয়াজগঞ্জে ও স্বরূপনগরের খাবরাপোতাতে আমরা আটকাতে পেরেছি। কয়েকস্থানে আমাদের কর্মীদের উপর তারা হামলা করেছে। আমাদের কর্মী আহত হয়েছে। আমাদের কর্মীরা মাটি কামড়ে লড়াই করছে। সব থেকে বেদনাদায়ক যেটা তা হল, কিছু পুলিশ অফিসার মুসলিমদের কাছে টাকা খেয়ে হিন্দু কর্মীদের উপর চরম অন্যায় অত্যাচার করছে। এরকমই একজন অফিসার স্বরূপনগর থানার চারঘাট ফাঁড়ির প্রভাত প্রামাণিক। এরা হিন্দু মাতৃগর্ভের লজ্জা। এই দুর্নীতিপরায়ণ হিন্দুবিরোধী পুলিশদের নাম ইতিহাসের খাতায় বিশ্বাসঘাতক রূপেই চিহ্নিত হবে। মানুষ এদেরকে ঘৃণা করবে।

নির্বাচন পরবর্তী নতুন পরিস্থিতির জন্য হিন্দু সংহতির কর্মীরা সজাগ ও সচেতন হয়েই আছে। হিন্দুকে স্বাধীনতার লড়াই লড়তেই হবে। তাদেরকে শুধু একটা বিষয়ের প্রতি সজাগ করে দিতে চাই। আগামী সংঘর্ষের দিনগুলিতে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত দলের হিন্দুদের আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাবেন হিন্দুর পক্ষে দাঁড়াতে। তাদেরকে সহজভাবে বলবেন যে, মুসলমানরা যদি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নামে দল ভুলে সবাই এক হতে পারে, হিন্দুর বিপদে অপমানে হিন্দুকেও দল ভুলে এক হতে হবে। যেহেতু সামনে নির্বাচন নেই, সেহেতু সব দলের হিন্দুকে আমরা পাশে পাবার আশা রাখি। দলীয় গন্ডীর ঊর্ধে এই হিন্দু ঐক্যই আমাদের লক্ষ্য। এই হিন্দু ঐক্যই একমাত্র পারে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে।

আমেরিকায় হিন্দু ইহুদী সংহতি দিবস

আমেরিকার হিউস্টন শহরে গত ১৯ জানুয়ারী ২০১১ পালিত হল প্রথম ''হিন্দু ইহুদী সংহতি দিবস'' (Hindu-Jewish Solidarity Day)। 'হিন্দুজ অফ গ্রেটার হিউস্টন' এবং ইহুদী সংস্থা 'ব্রিজ হিউস্টন' — এই সংস্থা দুটির যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়া হাউসে অনুষ্ঠিত এই প্রথম হিন্দু ইহুদী সংহতি দিবসে যোগ দিয়েছিলেন উভয় ধর্মের সন্ন্যাসী, কর্মী, মন্দির ও সিনাগগ এর প্রতিনিধিরা বৈজয়ন্তী বিবেক একটি সংস্কৃত মন্ত্র দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন, আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানালেন ব্রিজ ইউস্টনের প্রতিষ্ঠাতা ইরা, ব্লেইউইস্ তিনি বলেন, গত ২০০০ বছর ধরে ইহুদীরা ভারতবর্ষে বাস করছে। কিন্তু পৃথিবীর অনান্য দেশের ন্যায় ভারতে তারা কোনদিন ধর্মীয় অত্যাচারের স্বীকার হয়নি। তাই আমেরিকায় বসবাসকারী ইহুদী ও হিন্দুদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও জানান যে এবছর নভেম্বরে তারা যৌথ ভাবে দেওয়ালী উৎসব পালন করার পরিকল্পনা করছেন।

অস্টিন শহরের বরসানা ধামের সন্ন্যাসী স্বামী নিখিলানন্দ সংস্কৃত ভাষায় এবং ইহুদী পুরহিত (এদেরকে র‍্যাব্বি বলা হয়) স্টীভ মরগেন হিব্রু ভাষায় বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে ভারতে ইহুদী সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রা ও ইতিহাসের উপর ভি.ডি.ও. দেখানো হয়। হিন্দু সংস্থার পক্ষ থেকে ধর্মেন্দ্র কুমার, বিজয় পাল্লোড এবং গিরীশ নাইক অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। এই অনুষ্ঠান দেখে প্রভাবিত হয়ে জিউস হেরাল্ড ভয়েস পত্রিকার সাংবাদিক মাইকেল ডিউক বলেন 'গত ২০০০ হাজার বছরের হিন্দু ইহুদী ঐক্যের এই বার্তাকে আমাদের প্ররবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে যাতে আগামী ২০০০ হাজার বছর এই ঐক্যকে ধরে রাকতে পারে।

কল্যাণপুরে কর্মী সম্মেলন

গত ১ লা মে বারুইপর থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে হিন্দু সংহতির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই এলাকায় এই প্রথম সংহতির সম্মেলন আশপাশের ছয়টি গ্রাম থেকে সদস্যরা এতে যোগদান করে। সম্মেলনে এলাকার হিন্দুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ, সহ সম্পাদক প্রকাশচন্দ্র দাশ, কার্য্য কমিটির সদস্য সমর ভট্টাচার্য্য। দুপুরে ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। পুলক সরদার ও অন্যান্য স্থানীয় কর্মীদের উদ্যোগে এই সম্মেলন সফল হয়।

কাকদ্বীপে কাজ শুরু

কাকদ্বীপ থানা হিন্দু অধুষিত এলাকা। কিন্তু কাকদ্বীপ থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে উকিলের বাজারে হিন্দুরা মুসলিমের অত্যাচারে উতক্ত। তাই আহ্বান এসেছে সেখানে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু করার জন্য। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ২৯ শে এপ্রিল উকিলের বাজার সংলগ্ন ফটিকপুর গ্রামে হিন্দু যুবকদের একটি সভার আয়োজন করা হয়। পাশ্ববর্তী ছয়টি গ্রামের ৮০ জন যুবক এতে অংশগ্রহণ করে। সাগরদ্বীপ থেকে পাঁচ জন হিন্দু যুবক এখানে উপস্থিত ছিল। সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ এই বৈঠকে বক্তব্য রাখেন।

বিশ্বের চোখ-কান খোলাতেই হবে

১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবসে অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত শ্রীমতী মিরিয়াম জোন্সের ভাষণ-এর অনুবাদ

আজ আপনাদের সামনে কিছু বলতে পেরে নিজেকে সম্মানিত ও কৃতার্থ বোধ করছি। আমার সহকর্মী রিচার্ড বেনকিনের বিস্তারিত উপস্থাপনার পরে বেশী কিছু বলার নেই। আমরা যা শুনাছি তাতে বোঝা গেল যে, যা ঘটে চলেছে তা হিন্দুদের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। আমার বলতে দ্বিধা নেই এবং স্বীকার করি যে আমিও জানতাম না আপনাদের দুর্দশার কথা।

অস্ট্রেলিয়ায় 'ফোর্সফিল্ড' আমাদের একটি নূতন সংগঠন, কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা আরও খোঁজ-খবর করছি। আমরা এখানে শুনতে এসেছি, জানতে এসেছি। আমরা যা কিছু জানতে পারব তা আমাদের দেশগুলির — অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার সরকারকে জানাব। আপনাদের কথা তারা যাতে শোনে, আমরা তাই চাই। বিশ্ব বহুদিন ধরে এ ব্যাপারে সচেতন নয়। কিন্তু আমি নিজে এসব কথা শোনাতে এবং পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করব। আমি ক্যানবেরায় গিয়ে দরজায় দরজায় কড়া নাড়ব, যতক্ষণ না দরজা খোলে। আপনাদের কথা তাদের না বলে ছাড়ব না। শুধু বলা নয়, এসব কথা তাদের শুনতে বাধ্য করব। যখন দেখব তারা শুনছে তখন হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন বন্ধ করাতে তারা যাতে এগিয়ে আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখব।

দীর্ঘকাল এ সকল বিষয়ে বিশ্ব নীরব রয়েছে, তার কারণ তারা তা জানে না। 'ফোর্সফিল্ড' (FORCEFIELD) সংস্থা এর পরিবর্তন আনবে। অস্ট্রেলিয়ার জনগণ যাতে জানতে পারেন আমি তা দেখব। রাস্তা অনেকটা। কিন্তু বিশ্বের জনগণ যখন জানতে থাকবে, পরিবর্তন ততই হবে। আমি আমার বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই তাঁদের মহতী লক্ষ্যের উদ্দেশ্য সংগঠিত হওয়ার জন্য, আমাদের দেখানোর জন্য এবং আমাদের মারফত বিশ্বের কাছেও তা তুলে ধরার জন্য। এখানে যতটা আমি দেখব, জানতে পারব, ততটাই আমার মূলধন। পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।

বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের পরিণাম

বাংলাদেশে ঢাকার পাশেই টঙ্গি শহর। সেখানে তুরাগ নদীর পাড়ে প্রতি বছর শীতকালে মুসলিমদের বিশ্ব ইজ্তেমা অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে প্রায় ১৫ -২০ লক্ষ মুসলমানদের জমায়েত হয় এখানে। নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইসলামের ধর্মীয় উপদেশ ও ভাষণ এখানে দেওয়া হয়। এই ইজ্তেমাকে মক্কার হজের পরেই স্থান দেয় বাংলাদেশের মুসলমানরা। ভারত থেকেও বহু মুসলমান এই বিশ্ব ইজ্তেমায় যোগ দিতে বাংলাদেশে যায়।

এবছর ইজ্তেমার সময় বিপ্লব মারান্ডি নামে ২৫ বছরের এক খ্রীষ্টান আদিবাসী যুবক তাদের ধর্মীয় প্রচারপত্র বিলি করছিল। সে হয়ত ভেবেছিল যে খ্রীষ্টানদেশে মুসলিমরা যেরকমের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা পায় ও ব্যবহার পায়, মুসলিমদেশে খ্রীষ্টানরাও একই রকমের ব্যবহার পাবে। আজ জেলে বসে সে অনুশোচনা করছে আর বুঝতে পারছে যে তার ভাবনাটা কতটা ভুল ছিল।

গত ২১ জানুয়ারী সে যখন ইজ্তেমা সম্মেলনের বাইরে প্রচারপত্র বিলি করছিল, তখন তাকে ধরে সেখানে একটি চলমান কোর্টে দাখিল করা হয়। বাংলাদেশের আইনে ২৯৬ ধারায় তাকে দোষী সাব্যবস্ত করা হয় যে, সে ধর্মীয় সম্মেলনে ঝামেলা পাকাচ্ছিল। এই অভিযোগে বিচারপতি তাকে একবছর কারাদন্ড শাস্তি দেন।

বিপ্লবের দাদা রেভারেন্ড শৈলেন মারান্ডি ঠাকুরগাঁও জেলার একটি চার্চের পাদ্রী। তিনি জানান, তার ভাই যখন খ্রীষ্টান প্রচারপত্র বিলি করছিল সেখানে কোনরকম বাদানুবাদ হয়নি। কিন্তু মৌলবাদী মুসলিমরা এই কাজকে ইসলাম বিরোধী বলে মনে করে। তারাই গন্ডগোল করে আমার ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। তিনি আরও জানান যে তারা ভাইয়ের জন্য একজন মুসলিম উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই উকিল ভাইকে ছাড়ানোর কোন চেষ্টা করেনি, তাই তারা বর্তমানে লেন্সেন স্বপন গোমেস নামে একজন খ্রীষ্টান উকিল নিযুক্ত করেছেন। বিপ্লবের জামিনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

২০০৯ সালের ইজ্তেমাতেও ০১/০২/০৯ তারিখে মুসলিম তীর্থযাত্রীরা রাজেন মুর্মু নামে একজন বাইবেল স্কুল ছাত্রকে খ্রীষ্টান ধর্মীয় প্রচার পুস্তিকা বিলি করার অভিযোগে প্রচন্ড প্রহার করে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন র‍্যাব (Rapid Action Battalion) পুলিশ তাকে উদ্ধার করে তার প্রাণ বাঁচায়।

[সূত্র ঃ কম্পাস পত্রিকা, ঢাকা]

আফগানিস্থানে কোরান পোড়ানোর প্রতিবাদ

আমেরিকায় কোরান পোড়ানোর প্রতিবাদে আফগানিস্থানে দাঙ্গায় এ পর্যন্ত বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। রাস্তায় পুড়েছে অনেক গাড়ি। আগে থেকে বহুল প্রচার করে গত ২০ মার্চ আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে একটি চার্চে একজন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক টেরি জোনস্ এর তত্ত্বাবধানে প্যাস্টর ওয়েন্ স্যাপ বহু লোকের সামনে একটি ট্রের উপর একটি কোরান রেখে তাতে কেরোসিন ঢেলে অগ্নি সংযোগ করেন। প্রায় ১০ মিনিট ধরে কোরানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

আফগানিস্থানের শান্তিপূর্ণ শহর মাজার-এ-শরিফ গত ১ লা এপ্রিল শুক্রবারে কোরানকে অপবিত্র করার এই ঘটনার বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে ওঠে। সেখানে এক বিশাল জনতা সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে হামলা করে। এই হামলায় রাষ্ট্রসংঘের সাত জন কর্মী এবং চারজন আফগানের মৃত্যু হয়।

আমেরিকার উক্ত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকরা কোরানকেই আমেরিকায় ১১ ই সেপ্টেম্বরের জেহাদী হামলায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন। তাই কোরানের বিরুদ্ধে জুরির বিচার করে এই গ্রন্থকে পোড়ানোর আদেশ দেওয়া হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ও বিদেশ মন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন এই ঘটনার নিন্দা করেন। কিন্তু সে দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য এই ঘটনা আটকাতে তারা অক্ষম হন।

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ০৩/০৪/১১]

কারা করবে ধর্মের সংস্কার ? (৫)

তপন কুমার ঘোষ

আমাদের হিন্দু ধর্মের একটা গুরুত্ব পূর্ণ সংস্থা হল মন্দির। বোধহয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। খুব বড় সংখ্যার মানুষ মন্দিরে যাওয়া ও পূজা দেওয়াকেই ধর্মের একটা প্রধান কাজ বলে মনে করে। তীর্থযাত্রাকেও ধর্মের কাজ বলে মনে করা হয়। কিন্তু তীর্থ করতে কম লোক যায়। যারা যায়, তারাও তীর্থে গিয়ে কোন মন্দিরেই যায়। সুতরাং, এই মন্দিরগুলিতে ভূমিকা ও কার্যাবলীর একটু পর্যালোচনা করা দরকার। এগুলি আমাদের ধর্মের ও সমাজের প্রকৃত চাহিদাকে মেটাতে পারছে কিনা এবং ধর্ম ও সমাজের সামনে সমস্যাগুলির সমাধানে কোন অবদান রাখতে পারছে কিনা। কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারেন যে একজন ব্যক্তি মন্দিরে যায় তার ভগবানকে ডাকার জন্য। এখানে সমাজের কথা আসছে কেন? তার উত্তরে বলতে হয়, ভগবানকে তো ঘরে বসেই ডাকা যায়। সব স্থানে ভগবান বিরাজমান — আমরা তো একথা বিশ্বাস করি। তাহলে শুধু ভগবানকে ডাকার জন্য মন্দিরে যেতে হবে কেন? মন্দির তৈরীই হয়েছে ব্যক্তির জন্য নয়, সমাজের জন্য । সুতরাং, মন্দির মানেই মিলন স্থান, বিনা স্বার্থে, ভগবানের নামে, ধর্মের জন্য।

প্রকৃত ঘটনা হল, মন্দির আমাদের ধর্মের খুব পুরানো সংস্থা নয়। বেদে, রামায়ন বা মহাভারতে মন্দিরের উল্লেখ খুঁজে পাওয়া খুব দুস্কর। রামায়ণ মহাভারতে আশ্রম আছে, তপোবন আছে, তীর্থস্থান আছে, দেবতার বিগ্রহ সমন্বিত মন্দির দেখা যাচ্ছে না। এমনকি রামচন্দ্র সমুদ্র পার হওয়ার আগে রামেশ্বরমে যে শিব পূজা করলেন, তাও একটি শিব লিঙ্গ বানিয়ে নিয়ে, কোন শিবমন্দিরে গিয়ে নয়। প্রাচীনকালে আমাদের সমাজে কুলদেবতা ছিলেন, গ্রামদেবতাও ছিলেন। কিন্তু গ্রামদেবতাদের মন্দিরের বাহুল্য চোখে পড়ে না।

আমাদের সমাজে প্রথম ব্যক্তিপূজার বাড়াবাড়ি শুরু হল বুদ্ধদেবের সময় তাঁকে নিয়ে। তিনি শিষ্যদের অতীব ভক্তির পাত্র হলেন। তিনি বললেন — বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। তাঁর অধিকাংশ শিষ্য প্রথমটা নিল, আর দুটো নিতে পারল না। তার থেকে কিছু কম শিষ্য দ্বিতীয়টাকেও নিল। আর অতি অল্প শিষ্য তৃতীয়টাকেও নিতে পারল। সবাই মিলে তাঁকে এত উচুঁ স্থানে বসাল যে তিনি শিষ্যদের কাছে দেবতা হয়ে গেলেন। কিন্তু দু হাত-পাওয়ালা দেবতাদেরও মৃত্যু হয়। বুদ্ধদেবেরও মৃত্যু হল। কিন্তু ততদিনে বুদ্ধ পূজা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে তাঁর শরীরের কোন অংশ— নখ-চুল ইত্যাদি কোন স্মৃতিচিহ্নকে রক্ষা করার জন্য শিষ্যরা আকুল হয়ে পড়ল। সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য বিরাট বিরাট স্তুপ নির্মাণ হল। এই বৌদ্ধ স্তুপ গুলিই হল হিন্দু মন্দিরের পূর্বসূরী। তাই বুদ্ধ পূর্ববর্তী রামায়ন মহাভারতে মন্দিরের ভূমিকার কথা পাওয়া যায় না। তখন সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম মানে ছিল 'কর্তব্য ধর্ম' । আর ধর্মের অনুষ্ঠান বলতে ছিল হোম, যাগযজ্ঞ ও তীর্থযাত্রা। আবার এই যাগযজ্ঞও যাতে অনুষ্ঠান সর্বস্ব না হয়ে যায়, তার জন্য মহাভারতে সবিস্তারে সেই স্বর্ণ নকুলের গল্প বলা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়।

যাক, মন্দির তো হল। কিন্তু আমাদের ধর্মের গবেষণা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ কোন স্বাভাবিক বিকাশের ফলে হল না। হল কিছুটা অনুকরণে ও কিছুটা পরিস্থিতির চাপে। সুতরাং, মন্দিরের ভুমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হল না। তাই বলে মন্দিরের গুরুত্ব কিছু কম হল না।

এখন দেখা যাক, আমাদের মন্দিরগুলি কী ভূমিকা পালন করছে ও কী করা উচিত।

আমি দিল্লিতে চার বছর একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় মন্দিরেই ছিলাম। তাছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কাজের সূত্রে বহু মন্দির আমাকে ঘন ঘন যেতে হত। এছাড়া জম্মু কাশ্মীরে একটি অতি প্রাচীন মন্দির, পুঞ্ছে অবস্থিত বুড়া অমরনাথ মন্দিরের প্রাচীন ছড়ি যাত্রাকে নবজীবন দান ও জনপ্রিয় করার কর্মসূচীর প্রধান দায়িত্বে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশ ও বাংলাদেশে মন্দিরগুলিতেও বার বার যাওয়ার অভিজ্ঞতা তো আছেই। এসব থেকে যা দেখতে পেয়েছি তা হল, এই মন্দির গুলি আমাদের ধর্মের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মন্দির সমাজের সাধারণ অর্থাৎ গৃহস্থ মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। বাংলায় একটু কম। মন্দিরে গিয়ে দেববিগ্রহ দর্শন করা, পূজা দেওয়া ও দক্ষিণা দেওয়াকে মানুষ কর্তব্য বলেই মনে করে। মন্দির আমাদের আস্থার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই আস্থাই আমাদেরকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখছে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার অনুমান --- মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে সংখ্যালঘু তোষণের চরম কু-পরিণামে হিন্দুদের ধর্মান্তরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত। এছাড়া অনেক স্থানে মন্দিরগুলি সমাজের মিলনকেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে।

এগুলি হল মন্দিরের ভাল দিক। কিন্তু ঘাটতি ও অনেক আছে যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

প্রথমত, মন্দিরে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত আসে, শিবপূজা করে। কিন্তু ওই ভক্তরা যদি শোনে সেখান থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে আর একটি শিবমন্দিরের উপর বিধর্মী বা দুষ্কৃতকারীদের হামলা হয়েছে, অথবা পুলিশ এসেছে ভাঙতে, কতজন সেখানে ছুটে যাবে? খুব কম। তখন এই দ্বিতীয় মন্দিরের কর্তৃপক্ষ বা পূজারী ছুটবেন কোন হিন্দু সংগঠনের দপ্তরে সাহায্য চাইতে। পাশের মন্দিরে ছুটবেন না। সুতরাং একটি মন্দির তার ভক্তদের আস্থা ধরে রাখতে পারে, কিন্তু অন্য মন্দির বা ধর্মস্থান রক্ষায় ছোটাতে পারে না, অনুপ্রাণিত করতে পারে না। পাঠক একটু চিন্তা করুন তো — একটা মসজিদে হামলা হয়েছে খবর ছড়ালে মুসলমানরা কী করে? আশা করি বলে দিতে হবে না। তাই যতটা সহজে মন্দিরে ভাঙে, ততটাই সহজে মসজিদ গড়ে ওঠে। আর মন্দির ভাঙা যে দেশ ভাঙারই পূর্বধাপ, তা বুঝতে খুব বেশী মেধার দরকার হয় না।

দ্বিতীয় একটি খুব বড় ঘাটতি — আমাদের মন্দিরগুলিতে নিয়মিত কোন ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হয় না। ধর্মীয় উপদেশ মানে দেশ ধর্ম সমাজের প্রতি কী কর্তব্য — সেই উপদেশ। অথচ মসজিদে 'খুৎবা' দেওয়া হয়, চার্চে 'সারমন' দেওয়া হয়। ইমামের দেওয়া শুক্রবারের খুৎবা'তে বুশ থেকে বাজপেয়ী, লাদেন থেকে তোগাড়িয়া আর প্যালেস্টাইন থেকে আফগানিস্থান - সবই আসে। ফলে মুসলিমরা গুজরাট জানে, হিন্দুরা গোধরা জানেনা। মুসলমানরা গোলাম কাশ্মীর জানে, হিন্দুরা মানহারা নোয়াখালি জানে না। আজও সাধারণ বাঙালি হিন্দু দেগঙ্গার কথা জানে না। কারণ, আমাদের মন্দিরগুলি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটিয়েছে। কিন্তু ওই ভগবানেরই এক ভক্তের দুঃখ বেদনার কথা আর এক ভক্তের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি। এটা আমাদের মন্দিরের ব্যর্থতা। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, মন্দিরগুলিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। তার জন্য মন্দির পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতি শুরু করতে হবে।

এবার একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গে আসতেই হবে , অনেক মন্দির সরকার অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে বলে আমরা কেউ ব্যথিত, কেউ ক্রুদ্ধ। এই ক্রোধ অত্যন্ত ন্যায্য। আমাদের দেশের দু-নম্বরি ধর্মনিরপেক্ষতার বদমায়েসীতে হিন্দুর মন্দির দখল কর, কিন্তু মসজিদ গীর্জার গায়ে হাত দিও না। শয়তানী ধর্মনিরপেক্ষতার এই দুমুখো নীতি আমরা জানি। কিন্তু ..... একটা প্রশ্ন আমার তো মনে আসে, একটা উদাহরণ সহ বলা যাক। কালীঘাট বা তারাপীঠের মন্দির। ভক্তরা সারা বছরে সেখানে কোটি কোটি টাকা ও সোনা দিচ্ছে। কাকে দিচ্ছে? মা কালীকে দিচ্ছে। মা কালী তো ওই টাকা ভোগ করছে না। তাহলে ঐ টাকার মালিক কে হবে? এবং ঐ টাকা কী কাজে লাগা উচিত? মা কালীর কাজে অর্থাৎ ধর্মের কাজে নয় কি? নাকি কোন এককালে যিনি ঐ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর বংশধররাই শুধু ঐ টাকার মালিক হবেন? কোন্ যুক্তিতে, কোন্ যোগ্যতায়? মা কালীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ঐ টাকা দিয়ে তাঁরা মা কালীর কাজ বা ধর্মের কিছু করছেন কি? না, করছেন না। হ্যাঁ, মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় কিছু খরচ আছে। কিন্তু দক্ষিণা তো তার থেকে অনেক অনেক বেশী পড়ে। সেই অর্থে কি ধর্মের কাজ হওয়া উচিত নয়?

আমাদের দেশের ও রাজ্যের হিন্দু বিরোধী সরকারগুলি উর্দু, আরবী ও ফারসী ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারে হিন্দুর ট্যাক্সের টাকা জলের মতো খরচ করে। আর আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি সংস্কৃত ভাষাকে টুটি টিপে মেরে ফেলতে চায়। এটাই তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, এটাই তাদের সাম্যবাদ, এটাই তাদের প্রগতিশীলতা। তাদের কাছে বিদেশী আরবী ও পাকিস্তান সৃষ্টিকারী উর্দু প্রগতিশীল, আর সংস্কৃত প্রতিক্রিয়াশীল। এটা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু .... যে সংস্কৃত আমাদের ধর্মের ধারক, শাস্ত্র, দেবতা, ভক্তের পূজা মন্ত্রের ভাষা, সেই ভাষাকে সংরক্ষণের জন্য অধিক আয়ের মন্দিরগুলি কি সামান্য একটু ভূমিকা পালন করতে পারতো না? যে সকল মন্দিরের অতিরিক্ত আয় আছে, তাদের প্রত্যেককে একটা করে অবৈতনিক, এবং সম্ভব হলে নিঃশুল্ক আবাসিক সংস্কৃত টোল চালাতে হবে। শুধু সোনিয়া-বুদ্ধ- মমতাকে গাল দিলে আমাদের কর্তব্য সমাধা হবে না।

দ্বিতীয় একটি কাজ মন্দিরকে করতে হবে। যে সকল প্রাচীন মন্দির ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে ও যেগুলি কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তার মধ্যে বিশেষ করে যেসব এলাকায় হিন্দুর সংখ্যা খুব কমে গেছে, সেই রকম এক একটি জীর্ণ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিত্য পূজার দায়িত্ব নিতে হবে এক একটি স্বচ্ছল মন্দিরকে ।

এই স্বচ্ছল মন্দিরগুলি আরও তিনটি কাজ খুব সহজেই করতে পারে। করা উচিত। ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে একটি লাইব্রেরী করা মন্দির সংলগ্ন। আমাদের দেশে ধর্মীয় পুস্তকের প্রতি আগ্রহ কোনদিন কমবে না। গীতা, চন্ডী, ভারতের সাধক, তপোভূমি নর্মদা প্রভৃতি বই চিরদিনই মানুষ পড়বে। তাহলে দু-একজন ভক্তের পরিচালনায় দু-একজন কর্মচারী রেখে একটি লাইব্রেরী কেন চালাবেন না মন্দির কর্তৃপক্ষ?

দ্বিতীয় কাজটি বোধহয় আরও সহজ। প্রত্যেক স্বচ্ছল মন্দির একজন করে শিক্ষিত তরুণ গবেষক নিযুক্ত করুক। আমাদের জাতির সম্বন্ধে একটা বড় অভিযোগ যে আমাদের পূর্বপুরুষরা লিখিত, ডকুমেন্টেড ইতিহাস রেখে যাননি। ফলে আমাদের ইতিহাস জানতে হিউ-এন-সাঙ, ফা-হিয়েন্, বাবরনামা, আকবরনামার শরণাপন্ন হতে হয়। আমাদের শাস্ত্র আছে, পুরাণ আছে, কাব্য, মহাকাব্য, দর্শন, ব্যাকরণ- সব আছে। ইতিহাস নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর থেকে প্রায় ২৬০০ বছরের আমাদের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। প্রায় নেই। রাজাদের ইতিহাসও নেই, সাধারণ মানুষের জীবনকাহিনীও নেই। এখন বড় মন্দিরগুলি যদি একজন করে মধ্যমানের ও তরুণ গবেষক নিযুক্ত করেন, তাহলে আমাদের ইতিহাস আমাদের লোকের দ্বারাই লেখা হবে, কোন রাজানুগৃহীত দরবারী ঐতিহাসিকের দ্বারা নয়। এই গবেষকের কাজ হবে ঃ (১) উক্ত মন্দিরের ও আশেপাশের মন্দিরগুলির ইতিহাস, যতটা পাওয়া যায়, সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা, (২) ওই মন্দিরের বর্তমান কার্যাবলী ও অনুষ্ঠান তারিখ দিয়ে লিপিবদ্ধ করা, এবং (৩) উক্ত এলাকার চলমান আর্থ সামাজিক, ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক গতিবিধিকে লিপিবদ্ধ করা। মন্দির কর্তৃপক্ষ দ্বারা বছরে একটি বা দুটি সংকলনে এগুলিকে ছেপে প্রকাশ করা। আর আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কম্পিউটারে ডিজিটাল ফর্মে ও ডিভিডি-র দ্বারা সংরক্ষণ করা। এই সম্পূর্ণ কাজের মান যদি খুব উন্নত না হয়, তাহলেও চলবে। শুধু ভারতীয় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হবে। লাল আর নীল (শ্রীমতি টেরিজা) চশমা দিয়ে না দেখলেই হবে।

তৃতীয় কাজটিও খুব কঠিন নয়। সপ্তাহে বা পক্ষে বা মাসে একটি করে কথা বা প্রবচনের আয়োজন করা। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় হলে তো খুবই ভাল হয়। তাতে যদি বিতর্ক আসে, তাহলে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় বিষয় নেওয়া যেতে পারে। উপনিষদ পুরাণের কাহিনী, রামায়ণ- মহাভারতের কথা, কেউ আপত্তি করবে না। শুধু মন্দির পরিচালকবৃন্দ নিজেদের তমোগুণী জড়তা একটু ঝেড়ে ফেলে রজোগুণী উদ্যম নিয়ে লাগুন তো!

আর খুব বড় মন্দির যেগুলি আছে, তাদের আরও দুটি কাজ করা দরকার। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই করছেন। যেমন আদ্যাপীঠ ও মায়াপুরে ইস্কন। এক, একটি গোশালা চালু করা, ব্যবসার জন্য নয়। অর্থাৎ জার্সি গাই রাখলে চলবে না। দেশী গাই ও ষাঁড় রাখতে হবে। গরুর দেশী প্রজাতিকে বাঁচাতে হবে। এ কর্তব্য কি মন্দিরের নয়? শুধু আনিসুর রহমানের?

দ্বিতীয়, যে মন্দিরের অধীনে দেবোত্তর কৃষি জমি আছে, তাঁরা সেই জমির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশে হাই ব্রীড বাদ দিয়ে দেশী পরম্পরাগত বীজ দিয়ে ফসল ফলান। বিশেষ করে ধান ও গম। ভারতে ত্রিশ হাজার প্রজাতির ধান ছিল। এগুলি ছিল দেশের সম্পদ, বিশ্ব প্রকৃতির সম্পদ। হাইব্রীডের দাপটে এই সব প্রজাতি নষ্ট হতে বসেছে। এগুলি সংরক্ষণের কিছুটা দায়িত্ব কি বড় মন্দিরগুলোর নেওয়া উচিত নয়? সব দায়িত্বই কি সোনিয়া গান্ধী আর শরদ পাওয়ারদের?

মন্দির সম্বন্ধে আমার কথাই শেষ কথা নয়। কিন্তু সোমনাথ মন্দিরের কথা পাঠক ভেবেছেন কি? গজনীর সুলতান মামুদ ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর তখ্‌তে বসে ১০০০ খ্রীঃ থেকে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুট করেছিল। লুটের পরিমাণ ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু এ প্রশ্ন কি মনে আসে না যে একবার, দুবার, তিনবার মন্দির লুণ্ঠিত হওয়ার পরেও হিন্দুরা কেন আবার টাকা পয়সা সোনাদানা সেখানে দান করত? ঐ মন্দিরের পূজারীরা কেন ভক্তদেরকে বলেননি যে মন্দিরে টাকা না দিয়ে ওই টাকায় অস্ত্র কেনো।

আজ মন্দিরের পূজারী ও পরিচালক মন্ডলীকে স্মরণ করতে বলি — নগর পুড়িলে দেবালয় কি বাঁচে? তাই নগরকে অর্থাৎ দেশকে রক্ষা করার জন্য আপনাদেরকেও কিছু কর্তব্য করতে হবে। মন্দিরের কার্যপ্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন ও সংস্কারের দ্বারাই সেই কর্তব্য পালন করা যাবে। *(ক্রমশ....)*

চড়াবিদ্যায় সংঘর্ষ

দঃ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা এলাকায় সোয়াখালি গ্রাম। যদিও চড়াবিদ্যা বাসন্তী থানার অন্তর্গত। গত ১৮ এপ্রিল দুপুরে ছোট ছেলেরা মার্বেল খেলছিল কয়েকটি হিন্দু ও মুসলিম বালকের মধ্যে খেলা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ছেলেদেরকে মুসলিমরা প্রচন্ড মারতে থাকে খবর পেয়ে পাশের কুমড়াখালি গ্রাম থেকে সংহতি কর্মীরা ঐ হিন্দু বালকদের বাঁচাতে যায়। কিন্তু পূর্ব

ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সংহতি কর্মী চিরঞ্জিত মন্ডল

পরিকল্পিত ভাবে হোসেন গায়েন, হাসান, ইয়াকুন, ইউসুফ, ইব্রাহিম, এছা হকদের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ মুসলিম তৈরী ছিল। সুতরাং প্রচন্ড সংঘর্ষ বেধে যায়। মাত্র ১৫ জন সংহতি কর্মী তাদের সঙ্গে লড়তে থাকে। এতে উভয় পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়। হিন্দু সংহতির কর্মী চিরঞ্জিত মন্ডলের মাথা ফেটে যায়। তাকে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করে ছয় দিন চিকিৎসা করাতে হয়। এছাড়া জয়ন্ত সরদার, অমর বিশ্বাস, রতন মন্ডল এবং প্রতাপ দলুই ও আহত হয়। মুসলিমদের মধ্যেও হাজী নামে একজন আহত হয়।

আহত অমর বিশ্বাস ও অরুন মন্ডল যখন বাসন্তী থানায় অভিযোগ জানাতে যায় (যেহেতু তাদের বাড়ি বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৭ নং কুমড়াখালি গ্রামে), তাদেরকে পুলিশ থানায় বসিয়ে রাখে। পুলিশ তাদের অভিযোগ তো নেয়ই না, উল্টে তাদেরকে জানানো হয় যে তাদের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে জানা যায় যে শুধু তারাই নয় এই অভিযোগে মোট ১২ জন হিন্দু যুবক ও কিশোরের নামে জীবনতলা থানায় জামিন অযোগ্য ধারায় কেস করা হয়েছে। অমর ও অরুনকে কোর্টে হাজির করে আলিপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জীবনতলা থানা মুসলিম গুন্ডাদের ক্রীতদাস এবং সি.পি.এম. নেতা সওকৎ মোল্লার বৈঠকখানায় পরিণত হয়েছে। তাই সেখানে হিন্দুরা পাকিস্তানের হিন্দুদের থেকেও খারাপ ব্যবহার পায়। আর সওকৎ মোল্লার গড় ফাদার সি.পি.এম. এর প্রভাবশালী মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। এবারের নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জী এই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে রেজ্জাক মোল্লাকে এক প্রকার ওয়াকওভার দিয়ে দিয়েছেন। তাই, এই চরম সি.পি.এম. বিরোধী হাওয়াতেও নিশ্চিত করে বলা যায় যে এখানে রেজ্জাক মোল্লা সাহেব জিতবেন এবং সওকৎ মোল্লার অত্যাচার চলতেই থাকবে।

জীবনতলা থানায় এই রকম পরিস্থিতির জন্য আহত চিরঞ্জিত মন্ডল এর দ্বারা ক্যানিং এস.ডি.পি.ও. অফিসে দুজন হামলাকারী হোসেন গায়েন, পিতা নছিম এবং ইয়াকুব গায়েন, পিতা ইব্রাহিম — এর নাম দিয়ে অভিযোগ করা হলেও পুলিশ এখনও কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

গত ২৬ শে এপ্রিল আলিপুর কোর্ট থেকে অরুপ ও অরুন মন্ডল জামিন পেয়েছে। এখনও বাকি দশজনকে জামিন নিতে হবে।

মিনাখায় হিন্দু মহিলার শ্লীলতাহানি

গত ১৩ ই এপ্রিল দুপুর ১২ টা নাগাদ মিনাখা থানার অন্তর্গত মাদারী মালঞ্চ গ্রামের গৃহবধূ শ্রীমতি মিনা মন্ডল স্বামী অভিজিত মন্ডল তার ভাইঝি লক্ষীকে নিয়ে মালঞ্চ জেলে পাড়ায় শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছিল। মালঞ্চ বাস স্ট্যান্ডের কাছে কাদের মোল্লা (পিতা খালেক মোল্লা) নামে এক শয়তান মিনাদেবীর রাস্তা আটকে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "শিবের মাথায় জল দিয়ে কি হবে, তোর দু'টি স্তনের দুধ খাবো"। মিনাদেবী কাদেরকে বলে, "তোর মুখে জুতো মারবো"। তখন কাদের মোল্লা মিনাদেবীর সঙ্গে আরও অনেক রকমের অশ্লীল আচরণ করতে থাকে। মিনাদেবী ও তার ভাইঝি খুব ভয় পেয়ে যায়। তাদের প্রতিবাদ শুনে কাদের চিৎকার করে বলে —তোর কোন বাবাদের ডাকবি ডাক না, তারা আমার লোম সোজা করতে পারবে না তাদের চিৎকার শুনে মিনা দেবীর মা ছুটে এসে কাদেরের জামার কলার ধরে মেয়েকে ছাড়িয়ে নেয়। তখন কাদের মিনাদেবীর মায়ের হাতের চুড়ি ধরে বলে, "তুমি ব্যাটাছেলে হলে তোমায় দেখাতাম"। ইতিমধ্যে হিন্দুরা খবর পেয়ে ছুটে আসে কাদেরকে ধরে ফেলে উত্তম মধ্যম দেয় এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

মিনাদেবী ও তার স্বামী অভিজিত মন্ডল মিনাখা থানায় ডায়েরী করেছেন (জি.ডি. নং ৯০/১৩.০৪.১১)। মুসলিমরা এখন ক্ষমা চেয়ে কেস মিটিয়ে নিতে চাইছে।

দেগঙ্গার গ্রামে বিধর্মীরা হিন্দুকে উদ্বাস্তু করতে চায়

পশ্চিমবঙ্গের নোয়াখালি হল দেগঙ্গা। ২০১০ সালের ৬,৭ ও ৮ই সেপ্টেম্বর তিনদিন ধরে হিন্দুর উপর সংগঠিত মুসলিমদের লুঠ ও আক্রমণে সেটাই প্রমাণিত। এই ঘটনার পর থেকে ছোট বড় অনেক ঘটনা ঘটে চলেছে যার সব কিছু প্রচার পায়নি। অনেক হিন্দুই তাদের জায়গা সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টা চালিয়ে এলাকা ছাড়ার জন্য ব্যস্ত। মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে গত ১৭ এপ্রিল দেগঙ্গা থানার বসনা বেনাপুর গ্রামে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। বসনা বেনাপুর গ্রামে মাত্র ৮৫ ঘর হিন্দু, আশপাশ মুসলিম বহুল।

ইঁট ভাঁটার জন্য হিন্দুর জমি থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাবে মুসলিমরা আর এর কন্ট্রাক্টর হলেন মহম্মদ ইউনুস। হিন্দুরা বাধা দেয়। বাধা পেয়ে মুসলিমরা চক্রান্ত করতে থাকে এই ক'ঘর হিন্দু এবং এলাকার ক্লাব পলাশপ্রিয়া সংঘকে শায়েস্তা করতে। সেই পরিকল্পনাতে মহম্মদ ইউনুস ৬০-৭০ জন মুসলিমকে নিয়ে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ নাগাদ ক্লাবকে ঘিরে আক্রমণ করে দা, শাবল, লাঠিসোডা নিয়ে, হিন্দু বিদ্বেষী গালাগাল দিতে দিতে "এই ক্লাবকে ভেঙে সকল হিন্দুকে জ্যান্ত কবর দেব"। " তোদের মা বোনকে সঙ্গে নেব"। এর সাথে ক্লাবের মালপত্র লুঠপাঠ করে। যা নিতে পারেনি সেই সব জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে দেয়। ক্লাবের পাশে নারায়ণ মন্ডলের দোকান ভাঙচুর করে, তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে ও সোনার অলঙ্কার লুঠ করে যার আনুমানিক মূল্য পাঁচহাজার টাকা। ক্লাব সদস্য সুরজিত মন্ডলকে শাবল দিয়ে মাথায় মারে। সে স্থানীয় বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, আটটি সেলাই হয়েছে। "তোদের প্রাণে মেরে এই মাটি দিয়ে আমরা গাড়ী চালাব" এই ছিল প্রতিবেশী মুসলিমদের শান্তির বাণী! গনেশ মন্ডলের স্ত্রী মিনতি মন্ডলকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে মারতে তার শ্লীলতাহানি করে। সম্পূর্ণ ঘটনার নায়ক মঃ ইউনুস, তার নেতৃত্বে এই ঘটনাটি ঘটে। গণেশ মন্ডল যাদেরকে চিনতে পেরেছে তারা হল মহঃ লালটু, মহঃ নাসির হোসেন,মহঃ সাহিন, মহঃ মোস্তাকীন, কুতুবউদ্দিন, আলফাজউদ্দিন, মকিবুন, রসিদ মন্ডল, আরিফ বিল্লাহ ডাক্তার, মহঃ সুজাউদ্দিন, মহঃ কাহত, মহঃ ইমরান, মহঃ ইউনুস আলি, মহঃ কালাম, আমিনুর রহমান, আতিকুর গোলদার— এরা সকলেই পাশের আরিজ্জল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা। মামুদ হোসেন হাসনাবাদ থানার রামেশ্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা। আরো অনেকের পরিচয় জানতে পারা যায়নি।

এই ঘটনা নিয়ে স্থানীয় হিন্দুরা থানায় গেলে তাদেরকে দু'ঘন্টা ধরে বসিয়ে রাখে। এখনও পর্যন্ত পাঁচজন আক্রমণকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ঠাকুরনগর মেলায় হিন্দু সংহতি

গত ৩১ শে মার্চ ২০১১ ঠাকুরনগরে পূর্ণব্রহ্ম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২০০ তম জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হল। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সকল হিন্দুকে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যের বন্ধনে জাতীয়তা বোধ, সনাতন ধর্ম বোধ, হিন্দু চেতনা জাগ্রত করতে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও রক্তদান শিবির, চিত্র প্রদর্শনী ও জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন বিখ্যাত লেখক, লেখিকার বইয়ের স্টল দেওয়া হয়। বহু মানুষ এই প্রদর্শনী দেখতে সংহতির মণ্ডপে আসেন।

মহাপুরুষদের বাণী কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই সকল হিন্দুকে সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা ঐ আরবীয়, দানবীয়, বর্বর শক্তি প্রবল ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে হিন্দুর দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলেছে।

আজ পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে ইতিমধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, আমরা যদি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একত্রিত না হই তবে হয়তো আর মাত্র ৫টি বছর পর এই মতুয়া ধামটিও আমরা রক্ষা করতে পারবো না। তাই বন্ধু হিন্দুকে জাগ্রত করতে হবে। সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাই হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে সকল হিন্দুকে জানাই গৈরিক অভিনন্দন।

সংহতির পক্ষ থেকে ৩রা এপ্রিল, একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরকে আপন ভাই মনে করে অভিবাদন করে, এবং পুরুষ-মহিলাসহ হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ রক্তদান করেন। এই দিন সংহতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন তপন কুমার ঘোষ, এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী সুষেন বিশ্বাস, শ্রী অজিত অধিকারী, শ্রী দুলাল সমাদ্দার। এছাড়াও এখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী চঞ্চল দেবনাথ, শ্রী মিহির নাগ এবং আরও হিন্দু সংহতির বরিষ্ঠ কার্যকর্তাগণ।

দক্ষিণ সাঁকরাইলে অত্যাচার

হাওড়া জেলার দক্ষিণ সাঁকরাইল সাইডিং রেলজংশন। এখন রেল চলে না। রেলের এই অব্যাবহৃত জমিতেই একটি পাকা বেদী যেখানে ৩৭ বছর ধরে পূজা হয়ে আসছে। এটি সিংহবাহিনী কালিবেদী নামেই পরিচিত। স্থানীয় হিন্দুরা এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৮ এপ্রিল সোমবার সকালে বেদীর চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘিরে দেবে বলেই পরিস্কার করছিল, রেলিং বসানোর কাজও চলছিল। বেদীর পাশে একটি বন্ধ দোকান ঘর আছে করিম শেখের। পুলিশ এবং দক্ষিণ সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অজিত থান্ডার (নেপাল)-এর উপস্থিতিতেই কাজ চলছিল। করিম শেখরা বাধা দেওয়াতে থানার পুলিশ কাজ বন্ধ করতে বলেনি। দুপক্ষকেই কাগজ নিয়ে থানায় যেতে বলে। স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য— পুলিশ চলে যেতেই ৭০ থেকে ৮০ জন মুসলিম বোমা মারতে মারতে হিন্দুদের দিকে তেড়ে আসে, বেদীর চারিদিকে যে রেলিং এর কাজ চলছিল তা ভেঙে দেয়। অ্যাসিড বাল্ব ছুড়তে থাকে। বিকাশ মন্ডলের চপের দোকান বন্ধ করতে বলে তার গলায় অস্ত্র ধরে। ডাঃ অশোক রায়ের দোকান ভাঙে, তাকে রড দিয়ে মারতে যায়। অজয় সরদারের কাঠগোলা এবং তার ভাইয়ের মাটির বাসন পত্রের দোকান ভাঙচুর ও লুঠপাঠ করে। রমেশ মন্ডলের হোটেল ভাঙচুর করে। দিলীপ পাস্ত্রর সব্জির দোকান ভাঙচুর করে। "আদি পাল এন্ড সন্স"— পালের চায়ের দোকান ভাঙচুর করে দামিদামি চায়ের পেটি ফেলে দেয়। দোকান থেকে ২০ হাজার টাকা চুরি করে। একটি সাইকেল ও মোবাইল চুরি করে। স্থানীয় জনতা সংঘ ক্লাব ভাঙচুর করে। স্থানীয়দের বক্তব্য, পুজাকমিটির ১৫ হাজার টাকা ও গ্রিল লুঠ করে। সম্পূর্ণ এই ঘটনার নেতৃত্ব দেয় ফারুক মল্লিক, শাফিয়ার শেখ, ফরিদ শেখ, আলি শেখ সহ আরো অনেকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুজন মুসলমান ও দুজন হিন্দুকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এলাকাতে র‍্যাফ ও পুলিশ পিকেট বসানো আছে।

এই পত্রিকা পাওয়া যাবে **বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র**
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405